আমার হজ

আবুল হাসান মুহম্মদ বাশার

আদম্য প্রকাশ

উৎসর্গ

ডা. সৈয়দ গোলাম ছামদানী-
যার বন্ধুত্বকে আমি এই দুনিয়ার বাইরের
এক উপহার বলে বিবেচনা করি।

হজ – মৃত্যুর অনুশীলন

হজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ইসলামের পাঁচ ভিত্তির প্রতিটিরই আলাদা গুরুত্ব ও স্বকীয়তা আছে। তবে আচার হিসেবে হজ ইসলামের অন্য স্তম্ভগুলির চেয়ে একেবারেই আলাদা। হজ এমন কিছু বিষয় দাবি করে যা ইসলামের অন্য আচারগুলির ভেতরে নেই। হজ করতে হলে ঘর ছাড়তে হয়, পার্থিব জীবন থেকে বিচ্যুত হতে হয়। ইসলামে সন্ন্যাস নেই, কিন্তু হজ সফরে হজযাত্রীর মনে সন্ন্যাসের ভাবনা তৈরি হয়। সেই হিসেবে হজ মৃত্যুর অনুশীলন।

২০১৩ সালে আমি যখন পবিত্র হজব্রত পালন করি, আমার বয়স তখন ৪৩। চিকিৎসক হিসেবে পেশাগত জীবনে এই সময়টি তূমুল ব্যস্ততারই শুধু নয়, ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার সন্তান-সন্ততিরা তখনো বড় হয়ে ওঠেনি, অতএব সংসার জীবনের দিক থেকে দেখলেও সময়টি জাগতিক দায়িত্ব কর্তব্যের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমার চেয়ে কম বয়সেও অনেকে হজ পালন করে থাকেন, বেশি বয়সেও করেন অনেকে, কিন্তু বহতা জীবনের স্রোতটি যখন সবচেয়ে বেশি বেগবান, তখন সংসার নামের এই জীবন সমুদ্র থেকে ডুবসাঁতারে হারিয়ে যাওয়ার জন্য চল্লিশের আশেপাশের বয়সটিকেই আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হয়। আর কঠিন বলেই হয়তো এর মূল্যও অনেক বেশি।

যেহেতু লিখি, হজ পালনের আগে থেকেই হজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখার চিন্তা ছিল। বিগত দশ বছর ধরে একটু একটু করে লেখার এই কাজটি করেছি। এক দশক পরে হজ সফরের এই বিবরণটি যখন প্রকাশিত হতে চলেছে, এক দশক আগের সেই পৃথিবী আর নেই। নিয়ত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে সেটি আশাও করা যায় না। বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারির প্রকোপ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজায় জায়নবাদী ইসরায়েলের নজিরবিহীন বর্বরতা এই সময়কালটিকে ইতিহাসের পাতায় অনপনেয় কালিতে লিপিবদ্ধ করেছে। এই বই লিখতে গিয়ে হজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছি। তবে বৃহত্তর পরিসরে পাঠকের কাছে সেসব একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রতীয়মাণ হবে না- এই প্রত্যাশা করি।

ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান নিয়ে লেখালেখির কাজটি ইসলামি পণ্ডিত, চিন্তাবিদদের। আমি ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নই। ধর্ম সম্পর্কে আমার যতটুকু পড়াশোনা আছে, আমার নিজের হিসেবেই তা একেবারে অপ্রতুল। তবে একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আমার ভাবনা আছে, আবেগ আছে, গভীর ভালোবাসা আছে। সেই ভালোবাসা বুকে নিয়েই আমার হজের সফর, সেই ভালোবাসার ফলই আমার হজ সফরের এই বয়ান।

বিবরণটি হজের আদবের নয়, হওয়া সম্ভব নয়, সংগতও নয়- আলেখ্যটি হজের আবেগের।

সূচিপত্র

গ্রামের ছেলেটি	১৩
মনের হজ	১৭
ঢাকা মেডিকেল কলেজ : একটি বন্ধুত্বের গল্প	১৯
হজ এজেন্সি	২৫
হজের প্রস্তুতি	২৯
হজের প্রশিক্ষণ	৩৩
পরিবারের আমি	৪১
সফরের শুরু	৪৭
মরু আরবের প্রথম রাত	৫১
মক্কার পথে	৫৭
উমরাহ রজনী	৬১
জমজম- রহমতের জলধারা	৬৫
পায়ে পায়ে সাই	৬৯
মক্কার দিন	৭৩
তাওয়াফ ও মাতাফ	৭৭
হাজরে আসওয়াদ	৮১
মুলতাজাম ও মাকামে ইব্রাহিম	৮৩
হারাম শরিফের কর্মিবাহিনী	৮৭
অবাক বোধোদয়	৮৯
মক্কার বাঙালিরা	৯১
আরব আতিথেয়তা	৯৫
রোড টু মক্কা : মোহাম্মদ আসাদের বই	৯৭
মক্কার জিয়ারাহ	১০১

সফরের সঙ্গীরা ১১১
কাবা ও মসজিদুল হারাম ১১৫
বলকানের বৃদ্ধ ১১৯
আন্তর্জাতিক সাক্ষাৎকার ১২১
মদিনার পথে ১২৩
মদিনা : নবীর শহর, ইতিহাসের শহর ১২৭
রওজা-এ রাসুল ১৩৩
রিয়াজুল জান্নাহ ১৩৫
মদিনার দিন ১৩৭
মসজিদে নববীর পাঠাগার ১৪১
মদিনার জিয়ারাহ ১৪৩
আরাফাহর পথে ১৪৫
বিন দাউদ ১৪৭
হজ : মিনার তাঁবুতে ১৪৯
ময়দানে আরাফাহ ১৫৩
ওকুফে মুজদালিফা ১৫৭
মিনার পথে পায়দল ১৫৯
তাওয়াফ এ জিয়ারাহ ১৬৩
হুজুন (বিষণ্নতা) ১৬৭
ফেরার আগে ১৬৯
ফেরার পরে ১৭৩
উমরাহ - কাবার ডাক ১৭৫

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের মুখাপেক্ষী নন।

(সুরা আল ইমরান-৯৭)

গ্রামের ছেলেটি

ঢাকায় গ্রীষ্মের দিনগুলি দীর্ঘ। যারা ভূগোলের উৎসাহী ছাত্র, তারা জানেন এই অঞ্চলে বছরের এই সময়টিতে দিনের একটি বড় অংশজুড়ে সূর্যকিরণ লম্বালম্বিভাবে পড়ে। তবে আমার মনে হয় এখানে গ্রীষ্মের দিনগুলিকে লম্বা মনে হবার সেটিই একমাত্র কারণ নয়। এর সঙ্গে আরও অনেকগুলি বিষয় জড়িত। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ, বাতাসের অতিরিক্ত আর্দ্রতা, বিদ্যুৎ বিপর্যয়, শব্দ ও দূষণের মতো বিষয়গুলিও সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে দিনের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে এ রকম ধারণার সৃষ্টি করে। কে না মানে, কষ্টকর সময় সহজে পার হতে চায় না। এখানে আধভেজা ময়লা গামছা দিয়ে ঘামে ভেজা মুখ মুছতে মুছতে ক্লান্ত পায়ে প্যাডেল মারে যে রিকশাওলা- এই সব দিন তার কাছে যেমন লম্বা মনে হয়, তেমনি সরকারি অফিসে পুরোনো মরচে ধরা বৈদ্যুতিক পাখার নিচে স্তূপীকৃত ফাইলের পেছনে বসে থাকে যেসব কর্মচারি, তাদের কাছেও দিনগুলি কম দীর্ঘ নয়। যেসব ছাত্র দুপরের পরে পৌরনীতি ক্লাসে বসে শিক্ষকের বিরক্তিকর বক্তব্য শুনতে বাধ্য হয়, ঘুমঘুম চোখে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে তারাও ভাবে ক্লাসটি শেষ হয় না কেন! তবে আমার মনে হয়, গ্রীষ্ম দিনের দৈর্ঘ্য নিয়ে এই নেতিবাচক ধারণাটি এখানেই শেষ হয় না। বরং যারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে স্যুট-টাই পরে অফিস করেন বা যারা সবুজ রমনা পার্কে আম ও অশ্বত্থ গাছের ঘন ছায়ার নিচে বসে দুপুর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন, এ ব্যাপারে তারাও প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করেন।

আমার ঠিক এ রকম একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছিল, দিনটি দুপুর ও বিকেলের মাঝামাঝি এসে আটকে গেছে। আমি সেদিন একটু আগেভাগে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে বই হাতে শুয়ে পড়েছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম পড়তে পড়তে যদি ঘুম এসে যায়- মন্দ কী! দুপুরে ঘুমানোর সুযোগ তো আমার জন্য এক বিরল উপহারের মতো। ঘুমিয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগেনি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম তা-ও জানি না। কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল, চোখ মেলে আমি দেখতে পেলাম ঘরের হলুদ পর্দা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিনের আলো ঘরে ঢুকছে এবং সে আলোয় পড়ে আসা বিকেলের ম্রিয়মাণতা অনুপস্থিত। ঘুমটুকু আমাকে খুব আরাম দেয়নি বরং আমি আমার সারা শরীরে এক ধরনের জ্বলুনি বোধ করলাম,

সঙ্গে প্রচণ্ড পিপাসা। আমার বাসাটি ৯ তলায়, আশপাশে এত উঁচু অট্টালিকা খুব বেশি নেই। আমার বাসায় তাই সূর্যের দাপট, বাতাসের যাতায়াতে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। আমি ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পেছনের বারান্দায় এলাম এবং পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘরের উজ্জ্বল আলোর ব্যাখ্যাটি মিলিয়ে নিলাম - দেখলাম সূর্য আসলেই তখনো অনেক ওপরে। পাশের অট্টালিকার ওপরে ছোট্ট একটি ছাদবাগান- সেখানে ছোট ছোট নিম আর আমগাছের কচি পাতাগুলি রুগ্ন ও নিদ্রাতুর শিশুর চোখের পাতার মতো নেতিয়ে পড়েছে। কতগুলি চড়ুই পাখি তাদের সহজাত চঞ্চলতা ভুলে গিয়ে কার্নিশের ছায়ায় বসে ঝিমোচ্ছে। বাতাস বইছে না এবং সূর্য তখনো জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত গ্রীষ্ম বিকেলে আমার বাসার পেছনের বারান্দায় বসে আমার হঠাৎ মনে হলো আজ এই দিনের আমি যা দেখছি, আমার জীবনটিও কি ঠিক তাই নয়? পশ্চিম আকাশের সূর্যটি ডুবে যেতে এখনো বেশ খানিকটা সময় বাকি। আমার জীবনটিকে যদি ওই সূর্যের সঙ্গে তুলনা করি, তো সে ইতোমধ্যে মাঝপথ পেরিয়ে গেছে এবং পশ্চিমাকাশে তার অন্তিম যাত্রা শুরু করেছে। আমি সব সময় আমার জীবনকে পাহাড় অতিক্রম করে যাওয়া দীর্ঘ একটি পথের মতো ভেবে এসেছি। আমি উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে এর ঊর্ধ্বযাত্রা দেখেছি, আমি একে পাহাড়টির শীর্ষদেশ অতিক্রম করে যেতে দেখেছি - এখন আমার সময় এসেছে পাহাড় থেকে এর অবরোহণ প্রত্যক্ষ করবার।

মানুষের জীবনে চল্লিশ বছর বয়সটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যারা খেয়াল করে, তারা চল্লিশে পৌঁছে মনে মনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, অবাক হয়ে ভাবে - চল্লিশ! চল্লিশের সঙ্গে মানিয়ে জীবনটিকে সাজানোর চেষ্টা করে তারা। তবে অনেকেই চল্লিশের এই ব্যাপারটি খেয়াল করে না, ব্যস্ত জীবনের গতিজড়তায় হারিয়ে ফেলে। আমার বয়স যখন চল্লিশের এই গম্ভীর সীমানাটি পেরোলো, ভুলে যেতে যেতেও আমি একদিন আমার জীবনটির দিকে নতুন করে তাকিয়ে দেখলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমার এই দেখার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক ছিল। একটি সামনে, অন্যটি পেছনে। সামনের দিকটি সম্পর্কে যেহেতু আমরা কেউই ঠিকমতো জানি না, আমার সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ল পেছনের পথটির ওপর। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, পেছনের সেই পথ যাকে আমি সব সময় একটি মৃত প্রাণীদেহের মতো ফ্যাকাশে, স্থির ও অপ্রয়োজনীয় বলে ভেবে এসেছি, সেটি আর সে রকম নেই। বরং পথটি আবারও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে- যেন সদ্যপ্রসূত একটি গো-শাবক যে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, দৌড়াচ্ছে এবং পড়ে যাচ্ছে আর তার মা পৃথিবীর বুকে তার সন্তানের এই অভিষেক প্রত্যক্ষ করছে। আমার স্মৃতির গো-শাবকের এই আশ্চর্য প্রাণবন্ততা আমার চোখের সামনে একটি গ্রামের ছেলের ছবি ফুটিয়ে তুললো যাকে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ছেলেটির বয়স পাঁচ কি ছয়। একদিন সে গামছা পরে গ্রামের বাড়ির উঠোনের এক কোণে অজু করছিল। অজু করতে সে শেখেনি, গামছা পরার অভ্যাসও নেই। অনেক সময় নিয়ে অনেক

সাবধানে অজু করে সে যখন উঠে দাঁড়াল আমি তার আঙুল এবং কনুই থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরে পড়তে দেখলাম। গুটিগুটি পায়ে সে মাটির সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে চেষ্টা করছিল। সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে গামছা সরে যাওয়ার কারণে তার হাঁটু বেরিয়ে পড়ল। হাঁটুর ওপরে কাপড় উঠে গেল বলে অজু ভেঙে গেছে- এই ভেবে ছেলেটি আবারও উঠোনে ফিরে গিয়ে একই রকম যত্নের সঙ্গে অজু করল এবং বারান্দায় ওঠার চেষ্টা করল এবং এবারও ফলাফল একই হলো। বারান্দায় তার বোনেরা অপেক্ষা করছিল; ছোট ভাইটির এহেন দুর্দশায় তারা হেসে কুটিকুটি। শেষমেশ তারা ওপর থেকে হাত ধরে টেনে তাদের ভাইটিকে অজুসহ বারান্দায় তুলে নিল। আমার মনে হয় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সেদিন তার বোনেরাই শুধু নয়, আরও একজন মুচকি হেসেছিলেন। জগৎ বিধাতার সেই হাসিতে- আমি আজ বুঝতে পারি- প্রশ্রয় ছিল, আর ছিল স্নেহমাখা এক পথের নির্দেশনা। এই জীবনে আমি বহুবার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জলরাশি অতিক্রম করেছি। আমি নিশ্চিত জানি, বিধাতার স্নেহদৃষ্টি ছাড়া সেই পথ পার হওয়া সম্ভব ছিল না।

মনের হজ

২০১৩ সালের প্রথম দিকে বাড়িতে যখন আমি আমার হজে যাওয়ার ইচ্ছের কথা জানালাম, আমার স্ত্রী কিছুই বলল না। সম্ভবত তার মনে হয়েছিল এ নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই, কেননা ভেবে দেখলে ওই বছর এটি ছিল আমাদের জন্য অসম্ভব এক চিন্তা। বড় ছেলেটির জুনিয়র সার্টিফিকেট আর মেজো ছেলের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে যোগ হয়েছে মেয়েটি, যে তখনো কেবল হাঁটতে শিখছে। অতএব, 'পরের বছর গেলেই ভালো হবে'- এ রকম একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে আমার স্ত্রী প্রসঙ্গটির ইতি টানল। আমি যে কেন ঠিক ওই বছরই হজ করার ইচ্ছে করেছিলাম, এখন আমার তা আর মনে পড়ে না। এ নিয়ে যতবার ভাবি ততবার আমি একটি ক্ষীণকায় উড়ন্ত প্রজাপতি দেখতে পাই, প্রজাপতিটি বিকেলের নরম আলোয় উড়তে উড়তে ঘাসের একটি পাতার ওপর আলতো এসে বসে এবং কিছুক্ষণ বসে থেকে উড়ে চলে যায়। নশ্বর সেই ঘাসের বুকে তার কোন স্মৃতিই অবশিষ্ট থাকে না।

আমার স্ত্রীর এহেন প্রতিক্রিয়া দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি এ নিয়ে লেবু চিপে তেতো বের করে ফেলার মতো কিছু করব না। বরং আমি অপেক্ষা করব। আমার দিনগুলি আবারও দৈনন্দিনতার ভেতরে ডুবে গেল যদিও আমি মাঝে মাঝে আমার বাচ্চাদের কাছে খেলাচ্ছলে প্রসঙ্গটি তুলতাম। উদ্দেশ্য এই যে ব্যাপারটি যেন সংসার সমুদ্রের একেবারে অতলে তলিয়ে না যায়। আমার ছেলেরাও বিভিন্ন ধরনের মজাদার মন্তব্য এবং পর্যবেক্ষণ দিয়ে এটিকে স্রোতের মুখে শুকনো পাটকাঠির মতো কোনোমতে ভাসিয়ে রেখেছিল। আমার ছোট ছেলের বয়স তখন ৬। সে আমার হজের প্রস্তাবনার ভেতরে যথেষ্ট যৌক্তিকতা খুঁজে পেল। হজ ব্যাপারটি কী- সে সম্পর্কে তার ধারণা থাকার কথা নয়, তবে সে জানে তার বাবার বিদেশ ভ্রমণ তার জন্য সব সময়ই লাভজনক ব্যাপার। চকলেট এবং খেলনার কথা মাথায় রেখেই বোধ হয় সে আমার হজের বিষয়ে তার সবুজ সংকেতটি দিয়ে দিল। আমার বড় ছেলেটি অবশ্য বেশ গম্ভীর হয়ে পড়ল। 'তার কি হজে যাবার বয়স হয়েছে?'- গজগজ করতে করতে একদিন সে তার মায়ের কাছে বলল। কথাটি আমার কানে এলে আমি একটু ভাবলাম। ওকে দোষ দেয়া যায় না, বাচ্চারা তো পারিপার্শ্বিকতা থেকেই শেখে। আমার শ্বশুর যখন আগের বছর হজে গেলেন, তার বয়স হয়েছিল ৭৩। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স ওর- হতে পারে ও এখনো এমন কাউকে দেখেনি যে

তার নানার চেয়ে কম বয়সে হজ করেছে। এটি তার মাথায় আসা হয়তো সম্ভব ছিল না যে কারও ওপর হজ 'অবশ্য করণীয়' হয়ে উঠার একটি ব্যাপার আছে। আর্থিক সক্ষমতার কথা ভাবলে আমি ইতোমধ্যে সেই পর্যায়ে পৌঁছেছি এবং সেটি মূলত ঘটেছে আমার মোটামুটি দীর্ঘ জাপান প্রবাসের সুবাদে। আমি অবশ্য ওর সঙ্গে এ নিয়ে খুব দীর্ঘ আলোচনায় গেলাম না বরং আমার নিজের ভেতরে সিদ্ধান্তটিকে মজবুত করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমার মা, ভাই ও বোনেরা অবশ্য আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত জেনে খুব খুশি হলো। হ্যাঁ, হজ অল্প বয়সেই করা উচিত- ব্যাপারটি তারা উপলব্ধি করতে শুরু করল। আমার নিজের ভেতরে যে তাড়নাটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে আমি অনুভব করছিলাম, সেটি ছিল একটি ধর্মীয় বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা। আমার মনে হচ্ছিল কাজটি খুব দেরি হয়ে যাবার আগেই করে ফেলা দরকার। আর কখন যে কার দেরি হয়ে যায়- কে জানে! প্রতি সপ্তাহে আমি ঢাকা-যশোর উড়ালপথের যাত্রী। হালকা গড়নের এটিআর ৫০ বা ৬০ উড়োজাহাজে করে আমার যাতায়াত। সত্যি বলতে কি এসব বিমানে চড়ে মাঝে মাঝে আমার বেশ অস্বস্তি হয়। উড্ডয়নের ঐ ৩০ মিনিট শিরদাঁড়ায় এক ধরনের শীতলতা অনুভব করি। আমার উচ্চতা-ভীতির কারণেই মূলত এমন হয় জানি, তবু এসব বিমানে আমি কখনোই পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করি না। অতএব আমার খুব দেরি করে ফেলা ঠিক হবে না- এ রকম একটি চিন্তাই ছিল হজ নিয়ে আমার সিদ্ধান্তের শেষ অনুঘটক। আর মনের প্রস্তুতির শেষ মানেই বৈষয়িক প্রস্তুতির শুরু এবং সেখানে শুরুতেই 'ম্যাজিক'। আমার স্ত্রী হঠাৎ করেই আমার হজ সফরের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পেল। আর কখনোই সে ছেলেদের পরীক্ষার প্রসঙ্গ তুলল না, ইচ্ছে করেই যেন ভুলে গেল যে আমি আসলেই ওদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছু সাহায্য করছিলাম। আমার বড় ছেলে ক্যাডেট কলেজে থাকায় মেজোটিকে নিয়ে আমি মাঝে মাঝে পড়াতে বসতাম। আমি ওকে ক্লাসের মূল পাঠ্য বইটি পড়াতাম। কেননা আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, এই জরুরি কাজটি স্কুলে বা কোচিং সেন্টারে খুব কমই করানো হয়। আমার স্ত্রী হয়তো ভেবেছিল এসব ছোটখাটো কারণে হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাঁধা দেওয়া সংকীর্ণতার পরিচয়। তার উদারতায় আমার কাজ হঠাৎ করেই অনেক সহজ হয়ে উঠল। আমি আমার স্ত্রীকে খুব সাহসী একজন মানুষ হিসেবে জানি- আরও একবার সে তার সাহসের পরিচয় দিল। আমি জানতাম আমার অনুপস্থিতিতে আমার ৬ সদস্যের বড় পরিবারটিকে দেখাশোনার কাজ সহজ হবে না। আমার অনুপস্থিতিতে সদস্যসংখ্যা একজন কমলেও আমার জন্য বাড়তি দুর্ভাবনা বোঝাটিকে তার জন্য কেবল ভারীই করে তুলবে। আমার মনে পড়ল ১৫ বছর আগের একটি ঘটনার কথা। আমাদের প্রথম সন্তানকে নিয়ে আমার স্ত্রী তখন ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমরা তখন জাপান প্রবাসে। সরকারি চাকরি বাঁচাতে আমার দেশে আসা প্রয়োজন। ওই অবস্থায় দীর্ঘ বিমান ভ্রমণ তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আবার ওই অবস্থায় বিদেশে একা থাকাও অস্বস্তিকর- দেশটি যতই জাপান হোক। মনে পড়ে চূড়ান্ত সংকটময় সেই সময়ে আমার স্ত্রী আমাকে দেশে আসার অনুমতি দিয়েছিল।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ একটি বন্ধুত্বের গল্প

ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমার শুরুর দিনগুলি ছিল বেশ অন্যরকম। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে আমি প্রথম দিকে ছিলাম। এতে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। কেননা পরীক্ষাটির জন্য কতটুকু শ্রম দিয়েছিলাম, সেটি আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানত না। কিন্তু যারা আমাকে ও আমার লেখাপড়ার ইতিহাসটি জানত, তাদের কাছে এটি ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি দেখলাম কলেজে আমার পড়াশোনা একেবারে পেছনের সিটে গিয়ে বসে পড়েছে। আমি খেলাধুলা করতাম, খেলাধুলায় আমার ছোটখাটো কিছু অর্জনও ছিল। অতএব খেলোয়াড় হিসেবে নিজের সুনামের প্রতি সুবিচার করার তাগিদটিই যেন বড় হয়ে দেখা দিল। তবে আমি জানি এটি শুধু সুবিচার অবিচারের ব্যাপার ছিল না। মূলত খেলাধুলার ব্যাপারে আমার আজন্মের ভালোবাসাই আমাকে দীর্ঘ সময় মাঠে আটকে রাখত। শুধু কলেজেই খেলতাম তা নয়, সুযোগ এলে ঢাকার বন্ধু ডাবলুর সঙ্গে খেলতে যেতাম বাইরে, শহরের বিভিন্ন মহল্লায়, আর দলবল নিয়ে স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে যাওয়া তো ছিলই। ঢাকা মেডিকেলে এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আমার লেখালেখির শখটি। ক্যাডেট কলেজ থেকেই আমার লেখালেখির শুরু, মেডিকেল কলেজ আমাকে এনে দিয়েছিল এক সম্পূর্ণ নতুন, বৃহৎ আর দারুণ উৎসুক এক মঞ্চ, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার লেখালেখিকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন পূরণের পথে প্রথম ধাপটি ছিল চমকপ্রদ- কলেজে ঢুকেই প্রথম যে সাহিত্য প্রতিযোগিতাটি আমরা পেয়েছিলাম, সেখানে স্বরচিত কবিতায় সেরার পুরস্কারটি উঠেছিল আমার হাতে। কবিবর শামসুর রাহমান স্বয়ং আমাকে চিঠি লিখেছিলেন তার পত্রিকা 'মুক্তধারায়' লেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে। মেডিকেল কলেজের বন্ধু ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের এক্স ক্যাডেট মাহবুব (বাপি) ছিল সাহিত্যের এক প্রকৃত সমঝদার। নিজে লিখত কম কিন্তু পাঠক হিসেবে ও ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। মনে পড়ে দিনের পর দিন ওর হাতে তলস্তয়ের বিশালাকায় উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় বোধ করতাম এই ভেবে যে মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র কীভাবে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের একটি বিষয়ে এতখানি আগ্রহী হতে পারে! ওর কাছ থেকে নিয়েই আমি

লিও তলস্তয়ের 'রেজারেকশন' 'অ্যানা কারেনিনা', গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'লাভ ইন দি টাইম অফ কলেরা' পড়েছি। মেডিকেল কলেজের শুরুর বছরগুলিতে সাহিত্যচর্চায় ওর সঙ্গে আমি অনেক আনন্দময় সময় কাটিয়েছি; আমরা পড়তাম, সাহিত্য নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনায় মশগুল হতাম আর মাঝে মাঝে আর এক বন্ধু মোহাইমেনের সঙ্গে মিলে সাহিত্য পত্রিকা বের করতাম। এত কিছুর মধ্যে ১৮-১৯ বছরের একটি গ্রামের ছেলের পক্ষে মাথা ঠান্ডা রেখে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া একটু মুশকিলই ছিল। আর ওই সময় পড়াশোনায় সিরিয়াস হবার আপাত কোনো কারণও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হ্যাঁ, ভালো ডাক্তার হবার তাড়নাটি মাথার ভেতরে কাজ করত বটে, তবে আমার মনে হতো - সে জন্য তো বিস্তর সময় পড়ে আছে। অতএব বই খাতা এবং আমার রিডিং পার্টনার নড়াইলের সেলিমুজ্জামানের (এখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. সেলিমুজ্জামান) সঙ্গে বসে আমি শুধু সেটুকুই করছিলাম যেটুকু না করলে পরীক্ষা পাস হয় না। খেলার মাঠে আমার সহখেলোয়াড়েরা ছিল, সাহিত্যবৃত্তে আমার সাহিত্যরসিক বন্ধুরা ছিল এবং এসবের বাইরে ছিল সুযোগমতো নির্জনতার সৌন্দর্যে ডুব দেবার তাড়না। এ রকম অবস্থায় সময় আমার কাছে ছিল এক পাগলা ঘোড়ার মতো, কেবল সুন্দরী রমণী ছাড়া সম্ভবত আর কেউই সেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরতে পারত না। সৌভাগ্যই বলি আর দুর্ভাগ্যই বলি, আমার স্বপ্নসুন্দরীদের কেউ তখনো আমার ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেনি। তাই মেডিকেল কলেজের এখানে সেখানে জোড়ায় জোড়ায় বসে পড়াশোনার ছদ্মাবরণে মন দেওয়া নেওয়ায় ব্যস্ত কপোত-কপোতীদের মধ্যে আমি ছিলাম না। অতএব আর একটি মাত্র কাজের জন্য কিঞ্চিৎ সময় আমার হাতে ছিল। কাজটি নামাজ। নামাজ পড়ার অভ্যাস আমার আগে থেকেই ছিল। ডা. ফজলে রাব্বী হলের দোতলার মসজিদটিতে আমার যাতায়াত কারও কারও নজরে পড়ে গেল। তারা লক্ষ্য করলেন যে প্রথম বর্ষের একটি ছেলে যাকে ফুটবল ও বাস্কেটবল মাঠেই বেশি দেখা যায়, মসজিদেও বেশ নিয়মিত। কালো চুল, কালো চামড়ার ছোটখাটো গড়নের ছেলেটি ঘামে ভেজা খেলার পোশাকে দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে ঢুকছে জামাত ধরতে- প্রায় নৈমিত্তিক এমন একটি ঘটনা কৌতূহলী জনতার নজরে পড়ারই কথা। কিছুদিনের মধ্যেই আমার কাছে নতুন অতিথিদের আসা-যাওয়া শুরু হলো।

তাবলিগ জামাতের সদস্য পঞ্চম বর্ষের ছাত্র আফতাব ভাই ছিলেন পুরোপুরি সুফি চেহারার মানুষ। পাঞ্জাবি, পায়জামা, দাড়ি-টুপিওলা আফতাব ভাইকে মসজিদে আগেই দেখেছিলাম। একদিন এশার নামাজের পর দুজন সঙ্গীসহ আফতাব ভাই আমার রুমে এসে আমার বিছানায় বসলেন। কথা শুরুর আগেই ওনার দুহাত এসে পড়ল আমার পায়ে। হালকা মাসাজ করতে করতে কথা শুরু করলেন। আমি তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারিনি, কেননা আমি কোনোভাবেই বুঝতে পারছিলাম না যে কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য তার পায়ে হাত দিতে হবে কেন! আফতাব ভাইয়ের কথার ভেতরে এমন এক ধরনের যত্ন আর ভালোবাসা